# বিজ্ঞানের জানা অজানা

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

# নিবেদন

স্কুলে বিজ্ঞান পড়ান এমন একজনের সাথে কথা হচ্ছিল। তিনি একজন বিজ্ঞান সাধকও। তাঁর দুঃখ এই যে, বিজ্ঞান পড়ানোর লোকের অভাব ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সমস্যার কারণে একালে বিজ্ঞানপাঠে উৎসাহ যেন কমছে। আর, স্কুলে স্কুলে বিজ্ঞানশাখা বন্ধ হচ্ছে।

দুঃখের হলেও এই কথার সত্যতা অনস্বীকার্য। তাই এই প্রচেষ্টা। লোকের অভাব মেটানোর ক্ষমতা আমার নেই। অন্য সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করেছি কেবল।

বলতে পারেন বাঙ্গালীর ঐ এক দোষ রবি ঠাকুরের কথা তাকে বলতেই হবে। কি বা করার আছে? ভদ্রলোক যে প্রায় প্রতিটি বিষয়ে কথা বলেছেন এবং যা বলেছেন তা যে অস্বীকার করার যোগ্যতা নেই আমাদের কারও। তাই যেন রবি ঠাকুরের কথা দিয়েই শুরু করতে হচ্ছে। তিনি যে বলেছিলেন গৌড়বাসী কথায় ভাসে, ঠিক কথাই তো। তাই যেন তিনিও অত সুন্দর একটা বই (বিশ্বপরিচয়) কথা দিয়ে সাজালেন, একেবারে, একালের কথাও যে তিনি বলে গেলেন সাহিত্যিকের ভাষায়।

অঙ্কের কথা অল্প হলেও বলতে হয়। বলতে হয়েছে, কিছু সমীকরণের কথা। একালেও, জানি তেমন পাঠক আছেন যিনি অঙ্কের কথা শুনলেই একটু যেন গুটিয়ে যান (স্মরণ করুন স্টীফেন হকিং —এর লেখা A Brief History of Time)। তবে, এটুকু নিশ্চয় বলতে পারি যে, নেহাত যেখানে. বাধ্য হয়েছি সেখানেই শুধু অঙ্কের কথা বা রেখাচিত্রের সাহায্য নিয়েছি বা বলেছি।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট গবেষক এবং আমার অশেষ প্রীতিভাজন শ্রী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলে যখন লেখেন যে, 'বিজ্ঞানের সংজ্ঞাটাই তাই ভারি গোলমেলে' তখন খুব চিন্তা হয়। তিনি বিজ্ঞানী বলতে চোখের সামনে 'বিরিঞ্চি বাবা'-র চরিত্র তুলে ধরেন (আপ্রন পরা, মাথায় উস্কোখুস্কো চুল এক আত্মভোলা মানুষের মুখ)। তাও ভালো, যে তিনি সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কুকে স্মরণ করেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি ইংরেজি অভিধানের সাহায্য নিয়ে 'সায়েন্স' শব্দটির অর্থ নিয়েছেন, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের

মাধ্যমে অর্জিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিই বিজ্ঞান। বর্তমান লেখক তার দেওয়া সংজ্ঞার চেয়ে অন্য কিছুকে গুরুত্ব দিলেও শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া সংজ্ঞা বাতিল করেনি যে তা পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন আশা করি।

অন্য কিছু কী?

অন্যদিকে যদি আইনস্টাইনের কথা শুনি তাতেও তো স্পষ্ট হয় না বিজ্ঞানের ধারণা। প্রশ্নটা তিনি এড়িয়ে গেছেন বলা ভালো। ওদিকে জে, ডি, বার্ণেল যা বললেন তাও বেশ অস্পষ্ট তিনি বললেন, ''যা বিজ্ঞানীরা করে তাই বিজ্ঞান''। তবে আমাদের ফিরতেই হয় সে কথায় যা পাই ইংরেজি অভিধানে।

মনে রাখতে চাই যে বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চায় শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা আছে। অন্তত ইউরোপীয় শিক্ষার বিষয়। একইসঙ্গে অবশ্যই আলোচনা প্রয়োজন বিজ্ঞানের দর্শন ইত্যাদি এবং একালে যখন আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব তখন পরিবেশের ওপর তার প্রভাব বাদ দিতে পারি না। বাদ দিতে পারি না নারী ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গও অথবা ধর্মের কথা। বিবর্তন বাদই বা বাদ পড়ে কেন? এই সব কিছুই যথাসাধ্য আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে।

বিজ্ঞান কী - এমন প্রশ্নের জবাব দেওয়া বেশ শক্ত, যেমন শক্ত ইতিহাস কী এমন প্রশ্নের জবাব দেওয়া। বিজ্ঞান মানে কি 'বিশেষ জ্ঞান'? তা বললে কিছুই স্পষ্ট হয় না। তাহলে - কাকে বলব বিজ্ঞান?

যদি এমন বলিঃ

বিজ্ঞান হল প্রকৃতি চর্চা, আর সে হল জ্ঞান উৎপাদী ক্রিয়া-কর্মাদি। আশা করা যায় যে, বিজ্ঞানীরা হবেন নিরপেক্ষ এবং আবেগহীন। জানি যথেষ্ট হল না এই সংজ্ঞায়। মুশকিল, খুবই মুশকিল। এতে গুরুত্ব পায় হয়ত পদার্থবিদ্যাই। তাই মেনে এগোই, কেমন। তবে কেবল পদার্থবিদ্যা নয় আরও কিছু আলোচনায় এসেছে। পাঠক সাধারণ সহজবোধ্য কারণে ব্যস্ত। তার মাঝেই আধুনিক ইতিহাসের কথা শুনতে চান তাঁরা। একালে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান যে উন্মাদনা ও উল্লাস সৃষ্টি করেছে তা অবশ্যই গুরুত্ব পাবার যোগ্য। যদিও তা নিয়ে তর্কও আছে। এর মধ্যে অনেক পথও পার হয়েছি। যার মধ্যে অনেক মানুষ নিশ্চয় আধুনিকতার পদধ্বনি পেয়েছেন। তাই, অন্তত অল্প হলেও আধুনিক কালের কথা আরও বলতে হয়।

মূল প্রশ্ন এই যে, কাকে বলব আধুনিক কাল। অনেক তর্ক নিশ্চয় আছে। আমরা সংক্ষেপে নবজাগরণের পরের অংশ আধুনিক কালরূপে আলোচনায় নেব। তাতেও তর্ক থাকে। নবজাগরণের কাল কাকে বলব? আমাদের বিবেচনায় সপ্তদশ শতকের ইতিহাস পর্যন্ত কেবল নবজাগরণ পর্ব পরের অংশ আধুনিক কাল বলে বিবেচনা করব, আধুনিক কালকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করে দেখব প্রথম ভাগ নিউটনের সময় থেকে, পরের ভাগ

নিউটনের পরের থেকে। এই সময় আর যারা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা কারা, কি তাদের অবদান?

ইতিহাস বলি তাকে যে শাস্ত্র পুরোনো ধ্যান-ধারণাকে নতুন রূপে নতুন আলোয় প্রকাশ করে। বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কার্যত যদি তা পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাস হয় ক্ষতি কী? আমরা হয়তো সেই পথই নেব।

এই রচনা তৈরির সময় যে প্রশ্নগুলি আমাকে নিরন্তর ভাবিয়ছে সেগুলি হল

১) People's History of Science এমন কিছু হয় নাকি?

২) ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস পাই কোথায়?

৩) ভারতীয় রেনেসাঁস বলে কিছু হয় বা ছিল কী?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলব — মৃদু স্বরে বলছি, না তেমন কিছু হয় না। অন্তত যেভাবে তা বলতে চেয়েছেন ক্লিফোর্ড কোন্নাররা তা মানতে পারি না।(যদিও শ্রী চট্টোপাধ্যায় অন্য কথা বলেছেন, বা অন্যভাবে তাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন), অনেকে অনেক ভাবে তা প্রমাণে চেষ্টা করেছেন, তা সত্ত্বেও বলি আজও যথেষ্ট প্রমাণ হাতে আসেনি যার সাহায্যে বলতে পারি জোরগলায় যে, না যে বিজ্ঞান পাঠে আমাদের আগ্রহ আসলে সৃষ্টি করেছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। তবু, তা বলছি, মৃদু স্বরে, কারণ, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ নিজ কাজের সূত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন যখনই তখনই সেই সমস্যা পার হতে তারা নানা কৌশল বার করেছেন, যা থেকে পরে বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র তৈরি হয়েছে। একথা অবশ্য সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রে কৃষক, শ্রমিক, নাবিক, সামুদ্রিক মৎস্যশিকারী ইত্যাদিরা বহুবিধ আবিষ্কারে আমাদের সাহায্য করেছেন তবু তাদের অবদানই যথেষ্ট নয়। People's History নিয়ে চর্চা করেন ও সমর্থন করেন এমন অনেকে মনে করেন যে, দেহে রক্ত সবংহন তত্ত্বের আবিষ্কারক উইলিয়ম হার্ভে নয় বা নিউটনের প্রথম গতিসূত্র বলে যা বিশ্বে পরিচিত সেসবেরই আবিষ্কার হয় চীনদেশে। এসব কথা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক Needham-এর সমর্থনও পায়।

অবশ্য, এই বিষয়ে কোনও মতবিরোধ নেই যে ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চীনদেশে বারুদ আবিষ্কার হয়। কিন্তু, তাতে প্রমাণ হয় না যে চীনদেশ তখনই ইওরোপের চেয়ে রসায়নবিদ্যায় এগিয়ে ছিল। Needham-এর মতো ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিকের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও এই কথা বলতে হয়।

তাই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলব এই কথা যে, বিজ্ঞানের ধারণা তৈরিতে সাধারণ মানুষের অবদান যা তার চেয়ে অনেক বেশী অবদান বিশিষ্ট প্রতিভাবান ব্যক্তিদের। তাঁরাই বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন।

এরপর স্বাভাবিক ভাবেই জানতে চাইব, বিজ্ঞান আলোচনায় আমরা কারিগরী বিদ্যাকে কতটা গুরুত্ব দেব? একথা অবশ্যই সত্য যে আমরা এমন অনেক আবিষ্কারের কথা

জেনেছি যা আগেই কারিগরদের কল্যাণে আমাদের আলোচনায় ঠাঁই পেয়েছে। অন্যদিকে আমরা যদি ম্যানহাটন প্রোজেক্টের মতো কিছুর দিকে তাকাই তবে নিশ্চয় বলব যে আমরা আগে জেনেছি তত্ত্ব, পরে এসেছে তার প্রয়োগ। এই বিষয়ে কথা বলতে আমরা কিছুতেই বাদ দিতে পারিনা, অন্তত একালে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার কথাও, যার প্রভাবে আমরা একালের শ্রেষ্ঠতর আবিষ্কারগুলির সুফল ভোগ করছি। এমন কথা বলছি কেন? অর্থাৎ কেন বলছি যে, কারিগরি বিদ্যার গুরুত্ব মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণার সাথে তুলনীয় নয়।

যা পড়েছি এবং যা বুঝেছি তা থেকেই এমন কথা বলার সাহস অর্জন করেছি বললে বুছি অত্যুক্তি হয় না। যা পড়েছি এবং যা বুঝেছি তা নিশ্চয় যথেষ্ট নয়, মানছি। তবু একথা বলতে চাই দ্বিধাহীনভাবে যে বিজ্ঞানসাধনায় বা বিজ্ঞানভাবনায় সাধারণ মানুষের অবদান যাই হোক বা যেমনই হোক তার সপক্ষে তথ্য-প্রমাণ হাজির করা বেশ শক্ত। শক্ত বলেই সে দাবি বাতিলযোগ্য এমনটাও বলতে পারি না। তবে নিশ্চয় এমনটা বলতে পারি যে, অনেকটা অনুসন্ধান শেষ করে এমন দাবি যদি তোলে তবে তা গ্রহণ করা যায়, অন্যথায় নয়। তবু, আমার জ্ঞানবুদ্ধি মতো যেখানে যতটুকু বলা সম্ভব হয়েছে সাধারণ মানুষের কথা বলেছি, তা যথেষ্ট নয় জানি, তবু ...

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলবঃ গ্রিক বা মেসোপটেমিয়া বা মিশরীয় সভ্যতার দিকে তাকালেই বুঝি যে তারা যা করেছেন তার ধারাবাহিক ইতিহাস তুলনায় সহজলভ্য। ভারতীয় দর্শন বা পুরাণের ইতিহাস সহজলভ্য নয় এবং তা বহু ক্ষেত্রে তাই কষ্টকল্পিত। আমরা ইতিহাস সচেতন গোষ্ঠী নই নিঃসন্দেহে। যেটুকু ইতিহাস-আশ্রিত তথ্য মিলেছে তাও মিলেছে ইউরোপীয়দের সাহায্যে।

মানতে হয় যে, এই ভারতীয় দর্শন তথা হিন্দুদর্শনই আমাদের বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে। তাই অন্য বঠজনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে চাই যে, ভারতের বিজ্ঞানচর্চা অতি পুরোন ঐতিহ্যের বাহক হলেও ইতিহাস তার কষ্ট করে পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলবঃ পন্ডিতদের মধ্যে যত বিবাদই থাক আমরা বিশ্বাস করি যে রেনেসাঁসের[1] দেখা আমাদের দেশেও পেয়েছি এবং সে সময় দর্শন তথা বিজ্ঞানচর্চা তার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব ফিরে পায়। সময়টা শুরু আকবর বাদশা'র আমলে হলেও এই দেশে তথা এই বাংলায় তার প্রভাব স্পষ্ট হয় উনিশ শতকে।

1 ইউরোপীয় রেনেসাঁসঃ মধ্যযুগের শেষে দেখা মেলে রেনেসাঁসএর। বলা যেতে পারে ইতালিতে এর দেখা পাই চতুর্দশ শতকের শুরুতে। বিভিন্ন দেশে এর দেখা মেলে বিভিন্ন সময়ে। ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন যে সপ্তদশ শতকের গোড়ায় অনেকটা নিভে যায় সমাজজীবনে এর প্রভাব। ভারতে আকবরের আমল থেকেই এর প্রভাব স্পষ্ট হয়। বাংলায় উনিশ শতকে এর পদধ্বনি স্পষ্ট হয়। এই সেই আন্দোলন যেখানে মানবতাবাদের প্রকাশ হয় স্পষ্ট এবং একে কেবল এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলে ভাবা ভুল। এই আলোচনাতেই আশা করছি স্পষ্ট হবে যে রেনেসাঁস বলতে আমরা কী বুছি। এই আলোচনা এবং এমন সব আলোচনাই সারা হয়েছে খুব সংক্ষেপে।

# গোড়ার কথা

গোড়ার কথায় ফিরি।

পৃথিবীতে মানুষ এল কবে আর কোথা থেকে? এই সেই প্রশ্ন যার উত্তর খুঁজেছে মানুষ, একালের সভ্য মানুষ, সভ্যতার গোড়া থেকে। উত্তর মিলেছে বলার সময় হয়তো হয়নি, আমরা এর উত্তর পেতে সাহিত্য, দর্শন, সমাজ বা জীবনের নানা শাখায় ঘুরেছি ফিরেছি তবু, আজও অস্পষ্ট বা অজানা পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষের আবির্ভাবকাল ও তার কারণ। মহাকাশ বিজ্ঞানীরাও(Cosmologist) বা জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ পদার্থবিদরাও (Astrophysicist) খুঁজে চলেছেন এই প্রশ্নের উত্তর। সে কী এক লক্ষ বছর আগের কথা, দশ লক্ষ বছর আগের কথা? জোর দিয়ে বলার মতো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই কারও কাছে। তবে আছে বেশ কিছু পরোক্ষ প্রমাণ। তেমন পরোক্ষ প্রমাণের ভরসায় মানুষ গ্রহণ করেছে ডারউইনের বিবর্তনবাদ সহ নানা তথ্য ও তত্ত্ব। তাতে অবশ্যই উত্তর খোঁজা শেষ হয়নি, বুঝি সে চেষ্টা শেষ হবার নয়। তবে বোঝা গেছে যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ যেখানে নেই সেখানে পরোক্ষ প্রমাণ নিয়েই এগোতে হবে। মানতে হবে যে, সে পথও বিজ্ঞানের পথ। যার অর্থ, আমরা একেবারে নিরস্ত্র নই। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের বিজ্ঞান ইতিহাসের পথ ধরেই এগোতে হবে, সেটাই হবে আমাদের প্রধান সহায় বা সন্ধানী আলোক উৎস।

বিজ্ঞানচর্চার যে শাখা সম্ভবত মানুষকে সর্বাগ্রে টানে তা নিঃসন্দেহে জ্যোতির্বিজ্ঞান। কারণ স্পষ্ট। টাইগ্রিস নদীতীরে মেসোপটেমিয়া হোক, বা নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা বা সিন্ধু নদের তীরে সিন্ধুসভ্যতা হোক - সর্বত্র মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনে মূলত কৃষি নির্ভর সমাজ গড়েছেন। সে কালের সব মানুষ জানতে চান কবে আসবে ফসল (ধান ইত্যাদি) রোয়ার সময়, কবে মানুষ ফসল তুলতে পারবে? এসবের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতেই হয়, নির্ভর করতে হয় বসবাস আর পশুপালনের জন্যও। ওদিকে মানুষ খোঁজে নিয়মানুবর্তিতা। মানুষ তো আর জঙ্গলে বসে থাকতে পারে না। তাই বন কেটে বসত তৈরি হয়। মানুষ আবিষ্কার করে যে প্রকৃতি চলে পূর্বনির্ধারিত নিয়ম

মেনে। সে আবিষ্কারের কথা জানতে আমরাও এগোব। সে কথা জানতে অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ সেই প্রকৃতির কথা জানতে আমাদের তাই এগোতে হয় তাদের পথ ধরেই। এই আলোচনা শুরু করছি জ্যোতির্বিজ্ঞান দিয়ে।

## জ্যোতির্বিজ্ঞানের আদিযুগ

স্মরণে রাখি যে, সভ্যতার বা মানব জীবনের প্রথম দিন থেকেই আকাশে ছড়িয়ে থাকা গ্রহ-নক্ষত্র মানুষের মনে জিজ্ঞাসার ঢেউ তুলেছে। নানা ঝড়-ঝঞ্ঝায়, বিপদে-আপদে মানুষ আকাশের নানা আলোক উৎসে খুঁজেছে পরিত্রাতার মুখ। গ্রহ-নক্ষত্র হয়ে উঠেছে দেবতা, কখনও অপদেবতাও। তাদের আসা-যাওয়ার সময় মিলিয়ে মানুষ মর্ত্যলোকে উৎসব, অনুষ্ঠান, পালাপার্বন, পশুপালন, নৌযাত্রা, চাষবাস ইত্যাদির দিন ঠিক করেছে। আকাশ পর্যবেক্ষণের আগ্রহ বা বাধ্যবাধকতা থেকে মানুষ সংগ্রহ করেছে নানা তথ্য যা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা সত্য, আবার তা থেকেই জন্ম নিয়েছে বহুসংস্কার বা কুসংস্কার। এরমধ্যে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হতে পারে অন্তত তিনটে। সে তিনটে বিষয় — দর্শন, ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কীত। আমরা দেখেছি বিজ্ঞান ইতিহাসের আদি যুগে তো বটেই, পরবর্তীকালেও, প্রধান বিষয় বা চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে দর্শনশাস্ত্র। দেশে দেশে এবং কালে কালে দর্শন আমাদের পথ দেখিয়েছে, পথ চিনিয়েছে।

## মিশর

শুরু করছি গ্রিক সভ্যতা থেকে, তবে শুরুর শুরু, যতদূর জানা গেছে (বা এমনও বলা যায় যে আমি যা জানি), মেসোপটেমিয়া থেকে। মেসোপটেমিয়ার মানুষের ধারণা ছিল স্বর্গ ও মর্ত দুটো চাকতি আকারের বস্তু, আর সে দুটি চাকতির মাঝে আছে জল। আবার, মিশরের মানুষ ভাবতেন, মহাবিশ্বের আকৃতি চৌকো বাক্সের মতো যার নীচে রয়েছে অবতল আকৃতির পৃথিবী, ওপরে রয়েছে আকাশ। আকাশ শূন্যে ঝুলে নেই, সে আছে পৃথিবীর চার দিগন্তের চারটি পর্বতচূড়ায় ভর দিয়ে। আকাশ থেকে নেমেছে এক নদী, যে নদী পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ফিরেছে আকাশে।

পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে সে নদী, সে নদীর নাম নীলনদ। আকাশ থেকে নদীপথে রোজ সকালে নিজের নৌকোতে চেপে বেড়িয়ে পড়েন সূর্য, নীলনদ বেয়ে, পৃথিবী ভ্রমণ সেরে আকাশে ফিরে যান তিনি প্রতি সন্ধ্যায়।

রূপকথার মতো শোনায় এখন, তাই না? অথচ, সেকালের মিশরীয়রা যা দেখেছেন তার সঙ্গে কল্পনা জুড়ে, দিন ও রাত্রির ব্যাখ্যা খুঁজেছেন তাঁরা এইভাবে। এইভাবে ব্যাখ্যা খোঁজার আগ্রহ ও প্রয়োজন থেকে তাঁরা সত্যসন্ধান করেছেন অনুমানে। মনে রাখতে চাই

যে মিশরীয় সভ্যতার আগে এসেছে ব্যবলনীয় সভ্যতা। তারপর (মিশরীয় সভ্যতার পর) এসেছে গ্রিক সভ্যতা।

যে কথা বলতেই হয় তা আবার বলি-মিশরীয়দের জীবনে নীল নদ প্রাচীনকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। একালের রাজনীতিতে ও অর্থনীতিতেও মিশরের, বিশেষত রাজনৈতিক কারণে সুয়েজ খালের গুরুত্ব অসীম। তবে আমরা সহজবোধ্য কারণে (পারতপক্ষে) রাজনীতিকে বা বাজার অর্থনীতিকে আলোচনার বাইরে রেখেই চলতে চাই। তবে, এই কথাও ভুললে চলে না যে, অন্তত একালের সমাজ রাজনীতিকে তথা বাজার অর্থনীতিকে বাইরে রেখে এগোতে পারে না। একথাও মনে রাখতেই হবে যে শুরুতে মিশর দেশেই আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা স্পষ্টতর হতে দেখি। তারও আগে নিশ্চয় মানুষ ছিল, যারা অরণ্য বা গুহা ছেড়ে এসেছে, গড়েছে নগর, গড়েছে সমাজ, গড়েছে শাসনরীতি। সেই সবের দিকে না তাকিয়েই কী আমরা এগোতে পারি? ভুলতে পারি না যে, প্রবল প্লাবনে নদী যেমন দেশ ভাসায়, তেমন সে শস্যশ্যামল করে তোলে তার প্লাবনভূমি।

বন্যা কখন আসে? কোনও পূর্বাভাস পাওয়া যায়? অনুসন্ধিৎসু মিশরীয় মানুষ আবিষ্কার করে যে, লুব্ধক নক্ষত্র দীর্ঘদিন উধাও হয়ে থাকার পর ভোরবেলা বছরের যে দিনটিতে প্রথম, সূর্যোদয়ের আগে, উদিত হয় আকাশে, নীলনদে প্লাবন আসে তার কয়েকদিনের মধ্যেই ঐশ্বরিক আশির্বাদের মতো। এরপরই শুরু করা যায় চাষবাস ও এভাবেই শুরু হয় মিশরীয় বর্ষ। লুব্ধক আবার একইভাবে তার পূর্ব অবস্থানে যখন ফেরে পূর্ণ হয় একটি মিশরীয় বছর। তার দেখা দেবার ও তিরোধানের মধ্যে ব্যবধান ৩৬৫ দিন, মিশরীয়রা তা থেকেই পেয়ে গেলেন বছরের দৈর্ঘ্য, যা নির্দিষ্ট ভাবে হল ৩৬৫ দিন।

মিশরীয়রা বছরকে ভাগ করতেন সম দৈর্ঘ্যের মাসে। এক অমাবস্যা থেকে পরের অমাবস্যা (অথবা এক পূর্ণিমা থেকে পরের পূর্ণিমা) এই অবকাশকে বলা হত মাস। চান্দ্রমাস। মাস থেকে দিন — দিন আবার ভাগ করা হল সমান দুই ভাগে — দিন ও রাত্রি। চান্দ্রমাস নিয়েও কম নয় জটিলতা। তবে কী সৌরমাস? তা নিয়েও জটিলতা কম নয়। সে সব কথা আমরা বিবেচনা করব যথাসময়ে।

লিপি আবিষ্কারের বহু আগেই আকাশপথে নানা গ্রহ-নক্ষত্রের আনাগোণা। বলতে চাই যে সে সময় (মনে রাখতে সুবিধা হতো বলে) মুখে মুখে রচিত হতো ছড়া, গাথা — যা এক প্রজন্ম থেকে ছড়িয়ে পড়ত অন্য প্রজন্মে। এভাবে পর্যবেক্ষণজাত সত্যের সাথে ছড়িয়ে পড়ত অজ্ঞতাজাত নানা কুসংস্কারও। কোনও সন্দেহ নেই যে, (আগেও বলেছি) কৃষিকার্য ছাড়াও নৌযাত্রা, পশুপালন বা বাসস্থান গড়াতেও গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির প্রভাব অস্বীকার করতেন না তাঁরা।

ইওরোপে লিপির আবিষ্কার হয়তো এসেছে দিন, মাস, বছরের ধারণা গড়ে ওঠার পর। কবে, কখন বা কারা আবিষ্কার করে লিপি তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। সুমেরীয়রা